যুগান্তর

তারিখ ... 06 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

প্রথম শ্রেণীর ভর্তি থেকে বই উৎসব কী আনন্দ, কী কান্না!

চেতনায় বুদ্বুদ

বদিউর রহমান

প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে এবার আমি তৃতীয় প্রজন্মে পড়লাম। আমার নিজের ভর্তি, তারপর আমার দু'ছেলের ভর্তি, আর এবার আমার পোতার (ছেলের ছেলে) ভর্তি— এ তিন প্রজন্মের ভর্তিতে ১৯৫৭ থেকে ২০১৫ (ডিসেম্বর) সে কী এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ষাটের দশকের শেষের দিকেও ছাত্ররাজনীতির দেয়াল-লেখনীতে স্লোগান ছিল— শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। আমরা যখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, তখন শিক্ষা সুযোগ না অধিকার তার কোনোটাই জানতে পারিনি। তখন শহরে কিন্ডারগার্টেন ছিল কিনা তাও জানতাম না। উত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সপ্তম শ্রেণী থেকে ক্যাডেট কলেজ ছিল সুপরিচিত। এখন কিন্ডারগার্টেন আর ক্যাডেট মাদ্রাসাও ছড়িয়েছে প্রায় গ্রাম্যবাজার পর্যন্ত। ছড়াবে নাই বা কেন, রাজনীতির পর স্কুল-মাদ্রাসা এখন আরেক বড় ব্যবসা। আগে আমরা বিষয়ভিত্তিক স্যার বলতাম, স্যারের নাম মুখে আনতাম না, অনেকের নাম জানতামও না। অতএব স্যারদের পরিচিতি ছিল হেড স্যার, হুজুর, বাংলা স্যার, ইংরেজি স্যার, অংক স্যার ইত্যাদি। এখন শিক্ষা ব্যবসায়ী অনেক স্যারের নাম দেয়ালে, ছোট্ট ছোট্ট কাগজে, সংবাদপত্রের ভাঁজে ভাঁজে অমুক স্যার, অমুক স্যার। তারপর আবার শ্রেণীর সে কী বিন্যাস— আর্লি ওয়ান, আর্লি টু, প্লে, নার্সারি, কেজি ওয়ান, কেজি টু, তারপর নাকি ওয়ান। কত বই, কত খাতা, কত রং পেন্সিল— শিক্ষার কত কত উপকরণ! দেশে যেহেতু সরকারি ব্যবস্থাপনায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কম, বিশেষত ছাত্রছাত্রীর অনুপাতে শহরে আরও কম, সেহেতু শিক্ষা এখন একটা ব্যবসারও ক্ষেত্র। টাকাওয়ালারা হাসপাতাল-ক্লিনিকের পাশাপাশি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও বেশ চালাতে পারছে। ভর্তির মৌসুমে তো কোনো কোনো অভিভাবক ঝুঁকি না নেয়ার জন্য সুযোগ হাতে রাখতে একাধিক স্কুল-কলেজেও নিজ সন্তানদের ভর্তি করিয়ে থাকেন। পছন্দমতো ভালোটাতে পরে যদি না হয়, এ ভয়ে হাতের পাঁচ হিসেবে অন্যটাতেও ভর্তি করিয়ে রাখেন। ভর্তির তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, ফল প্রকাশের (ভর্তির) তারিখ ভিন্ন হওয়ায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের এ ছাড়া উপায়ও থাকে না। ছাত্রছাত্রী পরে অন্য স্কুলে ভর্তি হল, আগের প্রতিষ্ঠান ফাও অনেক টাকা পেয়ে গেল, পরে আবার ওই শূন্য আসনে নতুন ভর্তি, আবার টাকা, কী মজা! আবার বড় ছেলেকে নর্থ সাউথে ভর্তি করিয়ে আমি দশ হাজার টাকা গচ্চা দিলাম। গত বছর এক বৃহস্পতিবার বিকালে ভর্তি করিয়ে শনিবার সকালে ভর্তি বাতিল করায়ও আমার এক নাতনির জন্য ক্যামব্রিয়ান আবার পঁচিশ হাজার টাকা খেয়ে ফেলল। মারবেই তো ভর্তি ফিস যে অফেরতযোগ্য! আহা, এমন ব্যবসা না হলে কী আর এসব প্রতিষ্ঠানের আলিশান আলিশান দালানকোঠা আর ক্যাম্পাস বাড়ে!

তিন প্রজন্মের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিতে কী পার্থক্য দেখলাম তা যেন ভাববার বিষয়। আমার দাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখন বলা হতো পণ্ডিত। আমি অবশ্য তাকে শিক্ষক হিসেবে পাইনি, আগেই তিনি অবসরে। তবে দাদার মুখে পণ্ডিতদের প্রভাব আর দায়িত্বের কথা শুনেছিলাম। আবিদ আলী পণ্ডিত নামে দাদার (এ দাদা মানে আব্বার আব্বা, বড় ভাই বা গডফাদার দাদা নন) এক সহকর্মী একদিন পড়া না পারায় স্থানীয় কদুর তেল কোম্পানির মালিকের ছেলেকে বেশ বেত্রাঘাত করেছিলেন। বেত্রাঘাত, নিলডাউন, সূর্যচেঙ্গী, নাকে খত, কানমলা, এমনকি স্লেট-ডাস্টার দিয়ে মারাও তখন স্বীকৃত শাস্তি ছিল। স্থানীয় জগইর গ্রামের ফেনী কদুর তেল কোম্পানির মালিকের বড় নাম, ফেনীতে তাদের কারখানা ও অফিস। আমাদের এলাহিগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্ররা ফেনী গেলে তাদের ফেনীর অফিসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতো। দানশীল হিসেবেও তাদের খ্যাতি ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হওয়ার পর ছোট্ট সময়ে তাদের নামে ছড়া হয়েছিল— অদুর বাপের কদুর লোট, রাস্তা হল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে তাদের সহায়তায় রাস্তা হওয়ার সুবাদে ছন্দমেলানো এ ছড়া তখন মুখে মুখে ছিল।

যাক যা বলছিলাম, বেত্রাঘাত খেয়ে ওই ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়ে আবিদ আলী পণ্ডিতের তাকে মারার কথা জানালেন। অভিভাবক ছেলেকে নিয়ে স্কুলে হাজির, দাদাসহ আবিদ আলী পণ্ডিত ভয় পাচ্ছিলেন, কদুর তেল কোম্পানির ছেলেকে মেরে না জানি কী ঝামেলায় পড়লেন। অভিভাবক মারের কারণ জিজ্ঞেস করলে পরপর কয়েকদিন পড়া না শেখার কারণ জানালেন আবিদ আলী পণ্ডিত। এরপর অভিভাবক পণ্ডিতকে বলে গেলেন, এরপর পড়া না শিখে এলে ছেলের সব মাংস আপনার, আমার জন্য শুধু তার হাড়গুলো রাখলেই চলবে। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলতেন, স্পেয়ার দ্য রড অ্যান্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড। আগে পড়ার জন্য মারের এমন স্বীকৃতি ছিল, এখন তা ভাবাও কষ্টকর। জমানা বদল গ্যায়া!

হ্যাঁ, জমানা বদল হওয়াতেই শিক্ষার প্রসার বেড়েছে, মান বেড়েছে কিনা এখনও প্রশ্নসাপেক্ষ। বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের চাকরির পরীক্ষা নিতে গিয়ে অনেক করুণ চিত্র লক্ষ্য করেছি। এবার প্রাথমিক পিইসি এবং নিম্ন মাধ্যমিক জেএসসিতে ফলের উন্নয়ন বড় আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু প্রকৃত মেধা কতটুকু হয়েছে তা এখনও ভাবায়। আগের শিক্ষকরা শেখানোতে যত আগ্রহী ছিলেন, এখন পাসের জন্য তত বেশি প্রতিযোগিতা। সরকারের স্কুল অনেক বেড়েছে, শিক্ষকদের সুবিধাও তুলনামূলকভাবে বেশ বেড়েছে, কিন্তু ছাত্রের প্রতি আগের মতো দায়িত্বশীলতা বেড়েছে মর্মে মনে হয় না। আমরা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে যেতে যেতে শিশুশ্রেণীতে বসে বসে পরে যে কোন ফাঁকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে গেছি বুঝতেই পারলাম না। দাদার মুখে শুনেছিলাম, আগে উচ্চ প্রাইমারি ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী ছিল নিম্ন প্রাইমারি, শিক্ষকরা বেশিরভাগ ছিলেন নন-মেট্রিক জিটি। জিটি মানে জেনারেল ট্রেনিং। মাঠে গরু বেঁধে দৌড়ে ক্লাসে এসেছেন কেউ কেউ। নিবেদিত প্রাণ ছিলেন অনেক শিক্ষক, হাতে-কলমে শিখিয়ে তবে ছুটি, দায়সারা বাড়ির কাজে অভিভাবকদের বোঝা তেমন বাড়াতেন না। সুন্দর হস্তাক্ষর, দ্রুতলিপি, শ্রুতলিপি— আমরাও পেয়েছিলাম। খড়িমাটির অর্থাৎ চকের কালো বোর্ডের সরকারের চলমান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার হার বেড়েছে, ঝরে পড়া কমেছে, কিন্তু বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবসর সুবিধা আর কল্যাণ ভাতা পাওয়ার দীর্ঘসূত্রতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার বছরের বেশি বিলম্ব বড় দুঃখজনক। এদিকে সরকারের নজর দেয়া আবশ্যক মনে করি।

আমার ভর্তি তো বিনা ভর্তিতেই হয়ে গেল। কিন্তু আমার দু'ছেলের বেলায় সে এক ভিন্নরূপ। একে-তো ঢাকা শহর, তদুপরি নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি— সে কী কাণ্ড! প্রথমে কলোনির বিদ্যানিকেতনে প্লে, তারপর, নার্সারি, অপর সুযোগ নিয়ে রাখার জন্য শুক্রাবাদে এক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে রাখা। এদিকে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার জন্য শিক্ষকের কাছে কোচিং, কোচিং ক্লাসের পর বাসায় অনেক শিটের হোম-ওয়ার্ক, ছাত্রের মায়েদের সে কী ব্যস্ততা! ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে, তার আগে নমুনা দেখে আমি-তো তাজ্জব, রীতিমতো বিসিএস যেন। ছাত্রগুলো দেখি অনেক এগোনো, এরা পারেও। বাংলা ছড়া, কবিতা, অংক থেকে শুরু করে সাধারণ জ্ঞান, কিছু জ্যামিতিক চিহ্ন, শূন্যস্থান, একজাতীয়, ভিন্নজাতীয় কত রকমের জ্ঞান-পরীক্ষা! আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে, কোনটি একজাতীয় নয় এমন এক প্রশ্নে মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, তামাক— এ চারটি শব্দ দিয়ে একজাতীয় নয় শব্দটিতে টিক দিতে বলা হয়েছে। স্কুলের মডেল উত্তর ছিল মাছ, কিন্তু এক ছাত্র তামাক বললে তার মা ভুল হয়েছে বললেন। ছেলে বলল, তাকেও নম্বর দিতে হবে, তারটাও শুদ্ধ। সে ব্যাখ্যা দিল মা মাছ, পেঁয়াজ, রসুন একসঙ্গে রান্না করেন, তামাক রান্না করা হয় না। অতএব ভিন্নজাতীয় হচ্ছে তামাক। কৌতূহলবশত তখন সহকারী প্রধান শিক্ষক জহিরুল হকের কাছে ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম। স্যার, এই পিচ্চির ওকালতি যুক্তি শুনে বললেন, হ্যাঁ, ওকেও নম্বর দিতে হবে, তার যুক্তিটাও ঠিক, সে মেধাবী। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো আরও চৌকস, এরা মায়ের পেটে থাকতেই ইলেকট্রনিক টাচ পেয়ে যাচ্ছে। আমার পৌনে দু'বছরের নাতনি যেভাবে মোবাইল অন করে হ্যালো-হ্যালো করে, আমি-তো থ' বনে যাই। ১৯৭০ সালে ল্যাবরেটরি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের 'পোয়াবারো' বাগধারা নিয়ে বাক্য গঠন দেখেছিলাম, সে লিখেছিল— শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে তোফায়েলের পোয়াবারো। আরেক ছাত্রের চা দিয়ে বাক্য ছিল— সকালে কাকগুলো, যেমন করে কা কা, বাঙালির ছেলেরা এখন ঘুম থেকে ওঠে করে চা চা। মেধার লড়াই, সে কী লড়াই; ভর্তির বেলায় নিজ ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখেছি। তা-ও ছোট ছেলে প্রথম চান্সে উতরায়নি, আরেক শিফট করলে তারপর ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় চান্সে টিকেছে।

এবার তৃতীয় প্রজন্মে ছোট ছেলের ছেলের ভর্তি নিয়ে কৌতূহল হল। ঘোষিত হল, প্রথম শ্রেণীতে শুধু লটারি। রূপনগরের মনিপুর শাখায় লটারিতে ওয়েটিং-এ নাম পাওয়া গেল। কিন্তু শোনা গেল, যে যায় সেই ভর্তি হতে পারছে। ফরম বিক্রি বাবদ সব স্কুলই বোধহয় টাকা নিয়েছে। শিরপুর-১৪-এর পুলিশ স্কুলে আগে ছাত্রের মৌখিক পরীক্ষা, তারপর লটারি। শোনা গেল, যারা মৌখিক পরীক্ষায় টিকবে তাদের রোল নম্বর থেকে লটারি হবে— সত্য-মিথ্যা জানি না। পোতাকে (নাতি) গেট থেকে ভেতরে নেয়া হল, কোনো অভিভাবক ঢুকতে পারেনি। কী প্রশ্ন হল, কি পারল না-পারল জানলাম না। লটারিতে নাম নেই। হারম্যান মেইনারেও লটারিতে নাম নেই। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে প্রভাতি শাখায় ছাত্রের সঙ্গে তার মা এবং আমিও মৌখিক পরীক্ষার সময়ে গেলাম। এ স্কুলে ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবক যেতে দিয়েছেন, বড় মুগ্ধ হলাম, অভিভাবক অন্তত ছাত্রের পরীক্ষা দেখতে পেরেছেন। বাংলা পড়তে দেয়া হল, আমার দাদা ভালো— লিখতে বলা হল। ছাত্র পড়তেও পারল, লিখতেও পারল, বরং দাদাকে ভালোর পরিবর্তে খুব ভালো লিখে দিল। শিক্ষক বললেন, একাডেমিক্যালি ফিট, কিন্তু সাইজে ছোট; বললাম, বয়স-তো সাড়ে পাঁচ পেরিয়েছে, প্লে-নার্সারি দুটো শেষ করেছে, যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ সহজগুলো পারে, দশ পর্যন্ত নামতাও পারে, এক থেকে একশ' বাংলা-ইংরেজি অংকে এবং কথায় লিখতেও পারে। প্রয়োজনে আরও পরীক্ষা নিন। কিন্তু আর পরীক্ষার প্রয়োজন নেই বলে সুন্দর ব্যবহারে আমাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু লটারিতে হল না। দিবা শাখায় লটারিতে নাম উঠল, ভর্তিও হল, ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিন উৎসব আমেজে নতুন বইও পেল। বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল বই বিতরণের উৎসবটা সেরে নিল, চমৎকার।

অনেক শিশু ভর্তি হতে পারেনি নিজের পছন্দের ভালো স্কুলে। তাদের মায়েদের কারও কারও সে কী কান্না! বিপরীতে যারা ভর্তি হতে পেরেছে তাদের সে কী আনন্দ! এক মা তো বলেই ফেললেন, দশটা স্কুলে দৌড়ালাম, তারচেয়ে নিজে একটা স্কুল খুলে ফেললেই ভালো করতাম। হ্যাঁ, এ জন্যই তো অলিতে-গলিতে কত কত স্কুল হয়েছে। আচ্ছা, ভর্তি নিয়ে এত কষ্টের কী কোনো সমাধান সম্ভব নয়? সরকার কি এ বিষয়ে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে না? পছন্দমতো একটা ভালো স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলে সে কী প্রশান্তি, অন্তত দশ বছরের স্বস্তি, যেন এক সোমনাথ মন্দির বিজয়। এ বিজয় আরও সহজ করা হোক।

বদিউর রহমান : *সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান*